# এ সহিংসতার জন্য কি রাজনীতিকরাই দায়ী নন?

কোনো একটু কিছু হলেই গাড়ি ভাংচুর, গাড়িতে আগুন দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করার রেওয়াজ আমাদের দেশে অনেক পুরোনো। যে কেউ যত সুন্দরভাবেই এর অতীত যৌক্তিকতা ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নিজেকে ভালোমানুষের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করাতে চাক, বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। বিষয়টি নিয়ে যতই 'নটের গুটি চালাচালি' হোক না কেন, আমরা মুখের জোরে নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি' কিংবা 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করি না কেন, এসবই দু'চোখওয়ালা মানুষের কাছে জঘণ্য কাজ বলে বিবেচিত এবং চাঁদের কলঙ্ক বলে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। আমরা যতই এসব কাজে প্রতিপক্ষের কাঁধে দোষ চাপিয়ে পার পেয়ে যাবার চেষ্টা করি, 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়ে পার পেয়ে যাই, কোনো পক্ষই ধোয়া তুলসীপাতা বলে নিজেকে দাবি করতে পারবো না। একাজ আমাদের স্বদেশি সংস্কৃতিতে পরিণত হতে চলেছে। কারণ সাধারণ মানুষ নীরব দর্শক হিসেবে খোলা দু-চোখ ভরে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়কেই তো দেখছে। যা কিছু ঘটছে, সাধারণ মানুষের চোখের সামনেই ঘটছে। মূল কথা হচ্ছে, এহেন কুসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। তাতে 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি' বাক্যের কলঙ্ক ঘোচার সম্ভাবনা থাকে; দেশের সাধারণ মানুষ ও ভুক্তভোগীরাও দারুণভাবে উপকৃত হয়।

আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এর প্রতিবাদ করতে পারি। এদেশের কোনো রাজনৈতিক জোট, যারা কখনো-না-কখনো ক্ষমতায় ছিল অথবা আছে, প্রতিপক্ষ কোনো জোটকে তাদের এর জন্য খারাপ বলা, তিরষ্কার করা বা প্রতিবাদ করা মানায় না। এতে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রত্যেকেই ধরা খেয়ে যাবে। কথায় আছে 'আপনি আচারি ধর্ম পরকে শেখাও'। আচ্ছা বলুন তো, একজন পকেটমার কি অন্য একজন পকেটমারকে পকেটমারার অপরাধে পেটাতে পারে? একজন ঘুষখোর অন্য আরেকজন ঘুষখোরের ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে তাকে চাকরিচ্যুৎ করতে পারে? আমরা সাধু সাজি, অন্তর থেকে সাধু হই না। এটা আমাদের জাতিগত স্বভাব। হোমিও চিকিৎসাবিদ্যায় বলা হয়, রোগ মানুষের দেহে নয়, মনে। এদেশের রাজনীতিকদের মন কঠিন রোগে আক্রান্ত। দিন যত সামনে যাচ্ছে, রোগের সংক্রমণ তত বাড়ছে। রোগটা কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ছোঁয়াচে। রোগটা পুরো সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও রোগটাকে নিরাময়যোগ্য করা কঠিন কিছু নয়, এটা আমার বিশ্বাস। গাড়ি ভাংচুর, আগুন সন্ত্রাসসহ সব ধরনের বিকৃত কর্মকাণ্ড– সবই এদের মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ মানুষ চায়, এ রেওয়াজ বন্ধ হোক। এ ছাড়াও 'মহান রাজনীতিকরা' বিকৃত কর্ম ও চিন্তা দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যতই দেশটাকে অন্ধগলির মধ্যে ঠেলে দিতে প্রস্তুতি নিক না কেন, আজ হোক আর কাল হোক, সাধারণ শান্তিকামী মানুষের জন্য তো দেশটাকে বাসযোগ্য করে তুলতেই হবে। দেশ ছেড়ে পালানো তো এর সমাধান নয়। তাই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর যত তাড়াতাড়ি চৈতন্যোদয় হয়, দেশের জন্য ততই ভালো। আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ এদেশে নেই জানি। থাকলে অসুবিধা কী? দেশকে যাদের দেওয়ার অনেক কিছু আছে, তাদের করার ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্বও নেই। যারা লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, আগুন নিয়ে খেলে, বিবেকের কোনো দংশন নেই, কাণ্ডজ্ঞান রহিত, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার ইচ্ছা, ধরাকে সরা জ্ঞান করার অধিকার ও কর্তৃত্ব তাদের। তারা সব ক্ষমতার উৎস। দেশটাও তাদের। আমাদের মতো ক্ষুদে মাস্টারসাহেব উচিত কথাটা বললেই জীবন বাঁচানো দায়। পদে পদে বিপদ। এসব কথা না বলে যে আর কোনো পথ নেই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাই বলতে বাধ্য হই। এ বিষয় নিয়ে আমি ব্যক্তিগত দুটো ঘটনা তুলে ধরবো। ঘটনা দুটো আমার অতিশয়োক্তি কিংবা 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' হবে না বলে বিশ্বাস।

বেশ ক'বছর আগে ইউরোপিয়ান কমিশনের স্কলারশিপ পেয়ে পোস্ট-ডক্টরাল রিচার্স করতে ইউরোপের একটা দেশে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। আমার সুপারভাইজার ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন খুব ঘনিষ্ঠ। মাঝে-মধ্যেই বসে আড্ডা দিতাম, চা খেতাম। তাদের সাথে তাদের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতাম। উদ্দেশ্য তাদের সমাজ, সামাজিক বুনন, অনুভূতি, সংস্কৃতিকে চোখে দেখা ও উপলব্ধিতে আনা। একদিন সকালে বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি ২০ মিনিট পর পর বাস আসছে, যা প্রতি ৫ মিনিট পর পর আসার কথা। মেট্রো আসে প্রতি ৫ মিনিট পর পর, সেটাও আসছে আধা ঘন্টা পর পর। ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে আধা ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। দেরির কারণে নিজে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করলাম, বাস ও মেট্রোর এ অবস্থা কেন। তিনি বললেন, 'ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে বাস ও মেট্রো কোম্পানি ধর্মঘট

ডেকেছে। কোম্পানির মালিকপক্ষ বেশ শক্ত লোক, ভাড়া এবার বাড়িয়েই ছাড়বে। জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য কোম্পানি ২০ মিনিট ও আধাঘণ্টা পর পর বাস ও মেট্রো ছাড়ছে'। বললাম, 'পথে তো ব্যক্তিগত ট্যাক্সি, মটরভ্যান ও গাড়ি নির্বিঘ্নে অনেক চলছে, সরকার এ দাবি সহজে মেনে নেবে না'। এ বিষয়ে অনেক কথাই হলো। মাঝপথে রসিকতা করে বললাম, 'দাবি মানানোর কৌশল আমি জানি। বাস ও মেট্রো কোম্পানিকে আমাকে পরামর্শক পদে নিয়োগ দিতে বলুন। একটা ব্যক্তিগত ট্যাক্সি ও গাড়িও পথে চলতে দেব না। কিছু সন্ত্রাসীকে টাকা দিয়ে ভাড়া করবো। কোম্পানির লোকজন পথে স্লোগান দিতে থাকবে। পথে যে কোনো যানবাহন বেরোলেই ভাংচুর করবে ও আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সরকার দাবি মানতে বাধ্য হবে'। নিজের দেশ থেকে অর্জিত টাটকা অভিজ্ঞতাটা চেপে গেলাম। আমি জানি, কিভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে দাবি মানতে বাধ্য করাতে হয়; নিজে দই খেয়ে কিভাবে অন্যের মুখে হাত মুছে দিতে হয়। অনেক বছর থেকে দেখতে দেখতে 'এ্যান এক্সপার্ট হেডমাস্টার' হয়ে গেছি। অন্তত এ অভিজ্ঞতা তাদের তুলনায় আমার ঢের বেশি। তিনি বললেন, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাকে জেলে পুরে রাখবে'। আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দলীয় বাহিনী হিসেবে দল-নিরপেক্ষ হয়ে কাজ না করার কথাও তাকে আর খুলে বললাম না। বললাম না আমাদের দেশের নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের তুলনায় দলীয় আনুগত্যের কথা। বুঝলাম, বাঙালির কুটকৌশল, চাতুরতা ও কুটবুদ্ধি সম্বন্ধে তারা কতই না অজ্ঞ! তারা এ কুটবুদ্ধির সংস্কৃতিটাই বোঝেন না! এ বিষয়ে আমার মতো বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে তাদেরকে অনেক বছর এদেশে বাস করতে হবে। বাঙালিকে চিন্তা ও কাজে চিনতে হবে।

একানব্বই সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলের এক সেন্টারে ডিউটি পড়লো। বড় দু-দলেরই নেতারা আমার সাথে এসে দেখা করলেন। ভোট ভালই হলো। ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনেও একই অঞ্চলের পাশের সেন্টারে ডিউটি পড়লো। এলাকার অনেকেই আমার চেনাজানা, এতে বেশ সুবিধা হলো। রুমে রুমে ঘোরাফেরা করছি। ঐ এলাকার মাঝারি পর্যায়ের এক ভদ্রলোক নেতা এসে আমাকে আমার নির্ধারিত রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, 'স্যার, আপনি শিক্ষক মানুষ। একটা কথা আপনাকে না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।' তিনি বলে চললেন, "একানব্বইয়ের নির্বাচনে আমরা বড় দুটো দল এক হয়ে নির্বাচন করেছি। কে কোন দলের কর্মী বাচ-বিচার করিনি। আমার বাড়ির পাশের জমিতে ঘর উঠিয়ে একঘর গরিব লোক বাস করে। তার ছেলেটার বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। আমি ওকে প্রায়ই স্লোগানে নিয়ে যেতাম। ওকে দিয়ে 'জর্দার কৌটায় তৈরি হাত বোমা' ছোড়াতাম। আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম। এবার গত তিন দিন আগ থেকে নির্বাচনে স্লোগান বন্ধ। আমরা সেদিন মিছিল করছি। আমি দেখলাম, 'ও আমাদের স্লোগান লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পালালো'। মিছিল থেকে ফিরে এসে আমি ওকে ডাকলাম। ও এলো। আমি ওর কান ধরে দু-তিনটা থাপ্পড় মারলাম। ও কাঁদতে কাঁদতে বাসায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই দেখছি ওর বাপ ওকে সাথে নিয়ে আমার কাছে হাজির। আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে বললো, 'আমার ছেলেকে তো আপনিই সন্ত্রাসী বানিয়েছেন। ওকে থাপ্পড় মারার আপনি কে? গত নির্বাচনে আপনারা বড় দু-দলই ছিলেন এক। ওকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আপনারা ক্ষমতায় গিয়ে ওকে গত পাঁচ বছর আর খোঁজ নেননি। ও এখন বড় হয়েছে। ও গত পাঁচ বছরে অন্য বড় দলে ভিড়েছে। ওরা এখন আপনাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ও এখন বড় সন্ত্রাসী। যেখানে সুবিধা পায় সেখানেই কাজ করে। বোমা ছোড়ার শিক্ষাটা তো আপনারাই ওকে দিয়েছেন। এখন আপনি আমার ছেলের গালে চড় মারার কে?' স্যার, ঐ লোকটা এভাবে না বলে আমার গালে যদি স্যান্ডেল দিয়ে দুটো বাড়ি দিত, তবুও আমি এত অপমানিত হতাম না। আমরাই তো আমাদের ছেলেগুলোকে নিজ হাতে নষ্ট করে ফেলছি। কাজটা তো ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। ঐ লোকটা আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। এ তিনদিন বড্ড চিন্তার মধ্যে আছি। রাজনীতি করবো কি না ভাবছি। আমরাই তো আমাদের দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানাচ্ছি। যখন আমার বাইরে যাচ্ছে, তখন তাকে খারাপ বলছি। জেলে দিচ্ছি, বিচার করছি।"

আমি নির্লিপ্তভাবে তার কথাগুলো শুনে গেলাম। আমার মনটাও এদেশের রাজনীতির প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল। আমি তো জানি, আমাদের আদর্শ বা মান হচ্ছে, 'আমি যা বলি তা তোমরা শোন, আমি যা করি তা তোমরা কোরো না'। আজ এ লেখাটা যখন লিখছি তখন 'তিপ্পান্নতম মহান বিজয় দিবস'। দেশের অন্য ভালো কোনো দিক ও বিষয় নিয়ে লিখতে পারলে আমার ভালো লাগতো। সে দিকে কলম চলছে না। দেশ নিয়ে বড্ড হতাশার মধ্যে পড়ে গেছি। দেশের মানুষকে আমরা পুরো দু-ভাগে ভাগ করে ফেলেছি। একপক্ষ অন্যপক্ষকে ঘোর শত্রু বলে গণ্য করছি। মনুষ্যত্বের দাবিকে উপেক্ষা করে

চলেছি। সবই আমাদের গোষ্ঠী স্বার্থপরতা, বিকৃত মানসিকতা ও জঘণ্য আত্ম-অহমিকার ফসল। আজ সকালে অন্যদিনের মতো পত্রিকা পড়িনি। টিভির সামনেও বসিনি। স্বাধীনতার এতটা বছর পরও বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এদেশ নিয়ে অনেক আপত্তিকর বাস্তবতার কথা বলে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করতে পারছি না, ভেতর থেকে বাধা আসছে। এতদিনে ক্রমে ক্রমে দেশটা বিশ্বের নিম্নমানের দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে চলেছে। আমাদের মূর্খতা, গুমরাহি (পথ গুম হয়েছে) ও পেশীশক্তির কাছে জাতীয় চেতনাবোধ, দেশপ্রেম, বিবেকবোধ ও জ্ঞান হার মানছে। আমরা নিকট ও দূরের পরাশক্তির পুতুলে পরিণত হয়েছি। এর পরিণতি এদেশের ভাবুক জ্ঞানীজনেরা একটু চোখ বুঝলেই নিশ্চয়ই তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। আল কুরআনের কথা মিথ্যা হতে পারে না, 'কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আল আসর, ১০৩: ১-৩)।

(১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

**ড. হাসনান আহমেদঃ** অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ